হাজারি খুঁড়ির টাকা

(গল্পগ্রন্থ – নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব)

গ্রামের মধ্যে বাবা ছিলেন মাতব্বর।

আমাদের মস্ত বড় চণ্ডীমণ্ডপে সকালবেলা কত লোক আসতো— কেউ মামলা মেটাতে, কেউ কারো নামে নালিশ করতে, কেউ শুধু তামাক খেতে খোশগল্প করতে। হিন্দু মুসলমান দুই-ই। উৎপীড়িত লোকে আসতো আশ্রয় খুঁজতে।

আমরা বসে বসে পড়ি হীরুঠাকুরের কাছে। হীরুঠাকুর আমাদের বাড়ি থাকে খায়। পাগল-মতো বামুন, বড্ড বকে—আর কেবল বলবে—ও নেড়া, একটু কুলচুর নিয়ে এসো তো বাড়ির মধ্যে থেকে। আমার মাসতুতো ভাই বিধু বলতো- কুলচুর কোথায় পাবো পণ্ডিত মশাই, ঠাকমা বকে। হীরুঠাকুর বলে—যখন কেউ থাকবে না ঘরে, তখন নিয়ে আসবি।

আমাদের গোমস্তা বদ্যিনাথ রায় কানে খাকের কলম গুঁজে চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকের পশ্চিম কোণে প্রজাপত্তর নিয়ে বসে বাকিবকেয়া খাজনার হিসেব করতো। সবাই বলতো বদ্যিনাথ কাকা লোক ভালো নয়। প্রজাদের উপর অত্যাচার অনাচার করে, দাখিলা দিতে চায় না। বাবা এ নিয়ে বদ্যিনাথ কাকাকে বকুনিও দিতেন মাঝে মাঝে। তবু ওর স্বভাব যায় না। বাবা কখনো প্রজাদের কিছু বলেন না। তাঁর কাছে আসতেও প্রজারা ভয় পায়। যখন আসে তখন কিছু মাপ করার জন্যে বা বদ্যিনাথ কাকার বিরুদ্ধে নালিশ করার জন্যে।

তামাকের অঢেল বন্দোবস্ত আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে। কেনা তামাকে কুলোয় না, সুতরাং হিংলি কিংবা মোতিহারি গাছ তামাক হাট থেকে কিনে আনা হয়। আমাদের কৃষাণ দুলাল মুচি সেগুলো বাঁশের উপর রেখে দা দিয়ে কাটে, তারপর সেই রাশীকৃত গুঁড়ো তামাক কোতরা গুড় দিয়ে মেখে মেটে কলসি ভর্তি করে রাখা হয়। যে আসচে সেই কলসির মধ্যে হাত পুরে এক থাবা তামাক বার করে নিচ্চে, কলকে আছে, ভেরেন্ডা কিংবা বাবলা কাঠের কয়লা আছে একরাশ, সোলা আছে বোঝা বোঝা, চকমকি পাথর আর ঠুকনি আছে— খাও কে কত তামাক খাবে। গ্রামের কতকগুলি লোক শুধু তামাকের খরচ বাঁচাবার জন্যেই আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে সকাল-বিকেল আসে— একথা আমার মাসতুতো ভাই বিধু বলে।

দুপুরের বেশি দেরি নেই। হীরুঠাকুরকে আমি বললাম—পণ্ডিত মশায়, নাইতে যাবেন না?

—কেন?

—এর পর জোয়ার এলে আপনি নাইতে পারেন না তাই বলচি। নিরীহ সুরে বললাম কথাটা।

—কখন জোয়ার আসে?

—এইবার আসবে।

—তুমি কি করে জানলে?

—আমি—আমি জানি। বিধু বলছিল।

—না, বসে নামতা পড়ো। কড়ি-কষার আর্যা মুখস্থ হয়েছে বিধুর? নিয়ে এসো—বলোশুনি।

বিধু না বলতে পেরে হীরুঠাকুরের বেঁটে হাতের চটাপট চড় খায়। আমি হঠাৎ ধারাপাতের ওপরে ভয়ানক ঝুঁকে পড়ি। এমন সময়ে আমাদের হাজারি খুঁড়ি এসে বদ্যিনাথ কাকার সামনে দাঁড়ালো।

হাজারি খুঁড়ি গোপাল ঘোষের পরিবার, ওর ছেলের নাম বলাই, আমার বয়সি, আমাদের সঙ্গে খেলা করে। গোপাল ঘোষ মারা গিয়েছে আজ বছরখানেক, ওদের সংসারে বড় কষ্ট। হাজারির এক পা খোঁড়া বলে গ্রামের সকলে তাকে হাজারি খুঁড়ি বলে ডাকে। সে এর-ওর বাড়ি ঝি-গিরি করে কোনোরকমে দিনপাত করে।

বদ্যিনাথ কাকা বললে—কী?

হাজারি বললে- ট্যাকা।

—কী?

—ট্যাকা এনেলাম।

—কিসের টাকা?

—এই ট্যাকা।

হাজারি লজ্জায় জড়সড় হয়ে গেল। বদ্যিনাথ কাকা বাবার দিকে চেয়ে বললেন—ও অম্বিক!

বাবা ছিলেন চণ্ডীমণ্ডপের ওদিকে বসে। কেননা, এদিকে ছেলেদের নামতা পড়ার গন্ডগোল ও বিভিন্ন প্রজাপত্তরের কচকচি তাঁর বরদাস্ত হত না। তিনি ওদিকে বসে নিবিষ্টমনে তামাক খেতে খেতে কী সব খাতার পাতা ওল্টাতেন। বদ্যিনাথ কাকা তাঁকে ডাক দিতে তিনি খাতার পাতা থেকে মুখ তুলে বললেন— কী?

—গোপাল গয়লার পরিবার কী বলচে শোনো। আমি তো কিছু বুঝলাম না। টাকার কথা কী বলচে।—যাও বাবুর কাছে যাও।

আমরা নতুন কিছু ঘটনার সন্ধান পেয়ে ধারাপাত থেকে মুখ তুলে কান খাড়া করে দু'চোখ ঠিকরে সোজা হয়ে বসলাম।

বাবা বললেন—কী হাজারি, কিসের টাকা বলছিলে?

—ট্যাকা এনেলাম।

—কিসের টাকা? তোমরা তো খাজনা করো না। গোপাল গয়লার ভিটের খাজনা মাপ ছিল।

—এজ্ঞে, সে ট্যাকা নয়—

কথা শেষ করেই হাজারি খুঁড়ি একখানা কালোকিষ্টি ময়লা নেকড়ার পুঁটুলি খুলে বাবার পায়ের কাছে ঢাললে— একটি রাশ রুপোর টাকা।

বাবা অবাক, বদ্যিনাথ কাকা অবাক, হীরু পণ্ডিত অবাক, আমাদের তো কথাই নাই। গরিব হাজারি খুঁড়ি একটি রাশ নগদ টাকা ঢালচে তার ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটুলি খুলে।

বাবা বললেন—এ কিসের টাকা? এত টাকা কেন এনেচ? তুমি পেলে কোথায়?

হাজারি মুখে ঘোমটা টেনে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে— উনি দিয়ে গিয়েছেন। আপনার ছেলে। আপনার কাছে রাখুন।

এতক্ষণে আমরা সবাই ব্যাপারটা বুঝলাম। হাজারি টাকাটা গচ্ছিত রাখতে এনেচে বাবার কাছে।

বাবা বললেন— টাকাটা আমার কাছে রাখবে?

—হ্যাঁ বাবা।

—কত টাকা আছে?

সে বললে—চারশো। আপনি গুনে দেখেন।

বদ্যিনাথ কাকা টাকা গুনে দেখলে ঠিক চারশো টাকাই আছে। বাবা বললেন—চারশো টাকা পুরোপুরি রাখতে নেই। এক টাকা কম কি এক টাকা বেশি রাখতে হয়। এক টাকা তুমি নিয়ে যাও। কোথায় এতদিন টাকা রেখেছিলে?

—ঘটির ভিতর বাবা।

—একটা কথা শোনো গয়লা-বৌ। তুমি গরিব মানুষ, টাকাটা দুই-এক টাকা করে নিয়ো না। এতে টাকা খরচ হয়ে যাবে, অথচ তোমার কোনো বড় কাজে আসবে না।

—বাবা, আপনি যা বলেন তাই করবো।

হাজারি চলে গেল।

বদ্যিনাথ বাবাকে বললে, দেখলে অম্বিক, ধুকড়ির ভেতর খাসা মাস। কে জানতো যে ওর ঘরে ঘটির মধ্যে তিনশো-চারশো টাকা আছে? ঝি-বৃত্তি করে সংসার চালায় এদিকে, আজকাল মানুষ চেনা দায়!

—যাও, কাজ করোগে। সে কথায় তোমার দরকার কী?

এই ঘটনার পর মাস পাঁচ-ছয় কেটে গেল। আবার আমরা বসে হীরুঠাকুরের কাছে ধারাপাত মুখস্থ করচি।

এমন সময়ে হাজারির ছেলে বলাই এসে কাঁদো কাঁদো সুরে বদ্যিনাথ কাকাকে বললে—মা মারা গিয়েচে নায়েব মশাই।

বদ্যিনাথ কাকা চমকে উঠে হাতের কলম ফেলে বললে- তোর মা? কোথায়—কই—তা তো জানিনে—এখানে মারা গিয়েচে?

—না। মোর ভগ্নীপতির বাড়ি, কালোপুরে।

—কবে গিয়েছিল?

—তা আজ দু'মাস। মুইও তো সেখানে ছেলাম।

একটু পরে বাবা এলেন বাড়ির ভিতর থেকে। বলাই গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালো বাবার সামনে। বদ্যিনাথ কাকা বললে— শুনলে অম্বিক, হাজারি মারা গিয়েচে।

—সে কি?

—হ্যাঁ, ও তাই বলচে।

—বলিস কিরে বলাই, শ্রাদ্ধ হয়ে গিয়েচে?

—তা হয়েল।

—তা তুই কী মনে করে এলি এখন?

—সে বলবানি। এখন মেলা নোকের ভিড়। নিরিবিলি বলবানি।

বাবা স্বভাবতই ভাবলেন যে বলাই টাকার জন্য এসেচে। কিন্তু তার বদলে সে যা বললে তাতে বাবা একটু অবাক হয়েই গেলেন।

কথাটা যখন বললে তখন বদ্যিনাথ কাকাও সেখানে ছিল।

বাবা বললেন—কী কথা বলবি বলাই?

—মোদের ঘরের চাবিটা নায়েব মশায়কে খুলে দিতে বলুন। ঘরে একটা ভাঁড়ে তিনশো ট্যাকা আছে, মা মরণকালে মোরে বলেচে।

—ভাঁড়ে?

—হ্যাঁ, একটা ভাঁড়ের মধ্যে।

—আর কোনো টাকার কথা বলেচে তোর মা?

—না।

—আর কারো কাছে কোনো টাকা আছে বলেনি?

—না। বলেছে ভাঁড়ে ট্যাকা আছে।

—বেশ, তুই চাবি নিয়ে ঘর খুলে দেখগে। —বদ্যিনাথ, ওর ঘরের চাবিটা দিয়ে দাও।

দুপুরের পর বলাই চাবি হাতে আবার আমাদের বাড়ি এসে বললে—ট্যাকা পেলাম না।

বাবা বললেন— টাকা পেলিনে? কোথায় গেল অতগুলো টাকা?

—ইঁদুরে-বাঁদরে নিয়ে কোথায় ফেলেচে বাবা। তখন বললাম অঘোর ঘোষের বাড়ির দিকি বাঁশঝাড়টা কাটিয়ে দেন। ঐ বাঁশঝাড় থেকে ইঁদুর-বাঁদর আসে।

—বটে।

—তা মুই যাই?

—কোথায় যাবি?

—মুই কালোপুরে চলে যাই। ভগ্নীপতির বাড়ি গিয়েই থাকবো। এখানে একা, ঘর থেকে কেডা রাঁধবে, কেডা বাড়বে। মা মরে গেল। দুটো রাঁধা ভাতের জন্যি কার দোরে যাবো?

—বুঝলাম। তোকে কোনো নগদ টাকা দিয়েছিল তোর মা?

—এক কুড়ি ট্যাকা দিয়ে গেছে। মোর কাছে আছে সে ট্যাকা। মুই তেলেভাজা খাবার কিনে খাই হাটে হাটে। একমুটো ট্যাকা।

—আচ্ছা তুই একবার মাসখানেক পরে আসবি। দেখি তোর মায়ের টাকার যদি কোনো সন্ধান করতে পারি। বুঝলি?

—সে আর আপনি কোথায় সন্ধান করবা? সে ইঁদুরে-বাঁদরে নিয়ে গিয়েচে। বাদ দ্যান।

—তাহলেও আসিস, বুঝলি?

বলাই চলে গেলে বদ্যিনাথ কাকা বললে— আরে অম্বিক, তোমাকে একটা কথা বলি। ও টাকাটা তুমি ওকে আর দিয়ো না। দেখচো ওর বুদ্ধিসুদ্ধি? অতগুলো টাকা নাকি ইঁদুরে নিয়ে গিয়েচে! ওকে আজ টাকা দেবে, কাল ওর ভগ্নীপতি ওর হাত থেকে ভুলিয়ে টাকাগুলো নেবে। মাঝে পড়ে— ন দেবায়, ন ধর্মায়। ছেলেমানুষের হাতে অতগুলো টাকা দিতে আছে? বিশেষ করে ওর মা মরণকালে যখন বলে যায়নি, তখন তোমার টাকার কথা কবুল করবারই বা দরকার কী? কেউ যদি এর পরে বলে, তখন বললেই হবে ওর মা জামাইবাড়ি যাবার সময় গচ্ছিত টাকা আমার কাছ থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। খাতায় তুলিনি ও টাকা। মুখে মুখে টাকা রাখা— কে সাক্ষী আছে টাকার?

বাবা বললেন— বদ্যিনাথ, সাক্ষী নেই বলচো? তখন চণ্ডীমণ্ডপে কত লোক ছিল জানো তো?

—তারা জানে না কিসের টাকা। তুমি মহাজনি করো, তোমার দেনার টাকা তো হতে পারে।

—খাতায় দেনার কথা প্রমাণ করতে পারবে?

—তা হাতচিঠি একখানা তৈরি করে ফেলি আজই। দু'বছর আগের তারিখ দিই।

—পাগল! টিপসই কে দেবে?

—মরা লোকের টিপসই বুঝে নিচ্ছে কে? কোর্টে তার টিপসই রুজু করাচ্ছে কে? আমার টিপসই যে হাজারির নয় তাই বা প্রমাণ হচ্ছে কিসে থেকে?

বদ্যিনাথ কাকা ধড়িবাজ ঘুঘু লোক। ওর পেটে বহু অন্যায় ফন্দি সর্বদাই বিরাজ করছে, নদীর জলে তেচোকো মাছের ঝাঁকের মতো। বাবা হেসে বললেন—তা হয় না বদ্যিনাথ, এ কোর্টে না-হয় গরিব বেচারা হারলো। কিন্তু উঁচু কোর্টে যে আমি হেরে যাব।

—উঁচু কোর্ট করছে কে?

—সে কোর্ট নয়—

বাবা আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন।

বদ্যিনাথ কাকা আর কোনো কথা বললে না।

মাস দুই পরে বলাই এসে হাজির হল একদিন। বাবা বললেন, ভালো আছিস বলাই?

—আপনার ছিচরণ আশীর্বাদে—

—তোর টাকার সন্ধান পেয়েছি।

—পেয়েছেন?

—পেয়েছি। একটা কাজ করতে হবে তোকে। তোদের সেখানে তোদের স্বজাতির মধ্যে কোনো মাতব্বর কেউ আছে?

—আছে। তেনার নাম সতীশ ঘোষ।

—আচ্ছা, সেই সতীশ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে আমার এখানে তুই সামনের বুধবারে আসবি। টাকার সম্বন্ধে তার সঙ্গে পরামর্শ করবো।

সেই বুধবারে বলাই আবার এল, সঙ্গে একজন আধবুড়ো লোক। গলায় ময়লা চাদর, পায়ে চটিজুতো, হাঁটু পর্যন্ত ধুলোপায়ে। সামনের দাঁত দুটো একটু উঁচু ওর। বাবা তখন পাড়ায় কোথায় বেরিয়েচেন। আমি আর আমার মাসতুতো ভাই বিধু গাছের কচি ডাব পাড়াচ্চি।

বলাই বললে—এই সতীশ ঘোষকে এনেচি। তোমার বাবা কনে?

সতীশ ঘোষ বললে, প্রাতঃপেনাম। আমাকে আপনার বাবা ডেকেচেন কেন জানেন কিছু? আমি তো তাঁকে চিনিনে। কখনো দেখিনি। ব্রাহ্মণ দেবতা, ডেকেচেন তাই এলাম।

—আমি তো কিছু জানিনে। বাবা আসুন। আপনি তামাক খাবেন?

—হাঁ বাবা, খাই। তামাক টিকে কোথায়, আমি সেজে নিচ্ছি।

আমি ঠাকুরমাকে গিয়ে বলতেই তিনি বললেন— তোমার বাবা বাড়ি নেই। ভিন্ গাঁ থেকে লোক এলে যত্ন করতে হয়। তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো এখন কি তাকে জলপান পাঠিয়ে দেওয়া হবে?

আমার প্রশ্নের উত্তরে সতীশ ঘোষ বললে জিভ কেটে— সে কি কথা? ব্রাহ্মণ দেবতা, তাঁর বাড়ি এসে আমি আগে তাঁদের পায়ের ধুলো না নিয়ে জল খাবো কেমন কথা? মা ঠাকরোন কই?

আমি তাকে ঠাকুরমার কাছে নিয়ে গেলাম। সতীশ গড় হয়ে ঠাকুরমাকে প্রণাম করে জোড়হাতে বললে আমার উপর কী হুকুম হয়েছে আপনার? আমি তো আপনাদের চিনিনে—তবে মনে ভাবলাম, ব্রাহ্মণ দেবতা যখন হুকুম করেচেন—

মিনিট পনেরোর মধ্যে দেখি সতীশ ঘোষ আমাদের ভেতর-বাড়ির রোয়াকে বসে কাঠাখানেক চিঁড়ে-মুড়কি আর আধখানা ঝুনো নারকেল ধ্বংস করচে।

ঠাকুরমাকে একটু মিষ্টি কথা বললে আর রক্ষা নেই। কত প্রজা যে বিপদে পড়ে এসে ঠাকুরমার মনস্তুষ্টি করে শক্ত শক্ত বিপদ পার হয়ে গিয়েচে তার ঠিক নেই। ঠাকুরমার মন অতি সহজেই মিষ্টি কথায় গলে। এদিকে বাবা অত্যন্ত মাতৃভক্ত। ঠাকুরমা যা বলবেন, তাই বেদবাক্য বাবার কাছে। ঠাকুরমা কেবল ভুলবেন না আমাদের কথায়। হাজার মিষ্টি কথা বলে নিয়ে এসো দিকি একটু তেঁতুলছড়া, কী একটু কাসুন্দি, কী এক থাবা কুলচুর! উঁহু, আসল কাজে ঠিক আছে ঠাকুরমা। তার বেলা— এই নব্‌নে, ভাঁড়ার ঘরের তাকের দিকে ঘন ঘন আনাগোনা করা হচ্চে কেন? খবরদার, ভাঁড়ারঘরের চৌকাঠে পা দেবে না বলে দিচ্চি—

একটু পরে বাবা এলেন। সতীশ ঘোষকে দেখে বললেন— এ কে? —না, না— তুমি খাও খাও— উঠতে হবে না। খেয়ে নাও আগে—

ঠাকুরমা বললেন—তুমি খাও বাবা, আমি বলচি। এ হল সতীশ ঘোষ। হাজারির ছেলে বলাই সঙ্গে করে এনেচে কালোপুর থেকে।

—ও বুঝলাম। আচ্ছা, বেলা হয়েচে, আমি চান করে আহ্নিক করে নিই। আহারাদির পর কথাবার্তা হবে। তুমিও গঙ্গায় চান করে এসো। দিব্যি ঘাট, চখা বালি, কোনো অসুবিধে হবে না।

সতীশ ঘোষ চণ্ডীমণ্ডপে খেয়ে মাদুর পেতে শুয়ে আছে। ঠাকুরমা বললেন—এতটা পথ হেঁটে এসেচ বাবা, একটু জিরিয়ে নাও খেয়েদেয়ে।

বিকেলে বাবা সতীশ ঘোষকে বললেন সব কথা। সতীশ অবাক হয়ে বললে—কত টাকা বললেন?

—চারশো টাকা।

—তা আমায় ডাক দেলেন কেন?

—তার মানে ওর হাতে টাকা দিতে চাইনে। ও ছেলেমানুষ, যেমন ওর হাতে টাকা পড়বে, অমনি ওর ভগ্নীপতি শরৎ ঘোষ ওর হাতে থাবা দিয়ে সমস্ত টাকা কেড়ে নেবে। তাকে আমি চিনি, অভাবগ্রস্ত লোক। ও বেচারি মায়ের ধনে বঞ্চিত হয়ে থাকবে। তার চেয়ে আমি তোমার হাতে টাকাটা দিই, তুমি রেখে দাও আপাতত, ওকে জানানোর দরকার নেই। জানালে বিরক্ত করে মারবে টাকার জন্যে, আজ দাও দু'টাকা, কাল দাও পাঁচটাকা— ওর সেই ভগ্নীপতি প্ররোচনা দেবে, যা গিয়ে টাকা নিয়ে আয়— বুঝলে না? তুমি টাকাটা রেখে দাও, বলাই সাবালক হলে সমস্ত টাকাটা ওর হাতে দিয়ে দেবে। তারপর সে যা হয় করুক গে। এখন তুমি আমি ভগবানের কাছে দায়ী আছি নাবালকের টাকার জন্যে। নাবালকের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব আমার এবং তোমার।

সতীশ হাতজোড় করে বললে—দেখুন দিকি, এই জন্যিই তো বলি ব্রাহ্মণ দেবতা। সাধে কি আর বলি। তা আপনি আমাকে ডাকলেন কেন? আমাকে কেন জড়ান? আপনার কাছেই তো—

—না। বলাই যদি এ গাঁয়ে বাস করতো, তবে টাকা আমিই রাখতাম। ওরা আমার প্রজা, ভিটের খাজনা নিইনে, তবে ব্যাগার দিতে হয় আমার বাড়ির ক্রিয়াকর্মে। প্রজা হয়ে থাকতো, ওর স্বার্থ দেখতাম। এখন যখন চলে যাচ্ছে, সে দায়িত্ব আমি রাখি কেন? সেই জন্যে ওকে বলেছিলাম, তোমার গাঁয়ের মাতব্বর লোক একজনকে ডেকে এনো। কেন, কী বৃত্তান্ত তা আর বলিনি। টাকা অতি খারাপ জিনিস সতীশ, তুমিও তো বিষয়ী লোক, আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে। টাকাটা আমি এনে দিই, তুমি নিয়ে যাও—

—আচ্ছা দেবতা, একটা কথা। আপনার যখন হুকুম, তখন নিয়ে আমি যাবো। তবে মোড়ল মাতব্বর আমি কিছুই নই। আপনাদের ছিচরণের চাকর—এই মাত্তর কথা। মোড়ল মাতব্বর আমি নই। কিন্তু একটা কথা—

—কী?

—যদি বলাই সাবালক হওয়ার আগে মারা যায়, তবে টাকার কী হবে?

—তাহলে মা ও ছেলের নামে এই দিয়ে স্বজাতি জ্ঞাতিকুটুম ভোজন করিয়ো একদিন। ওদের তৃপ্তি হবে।

—আহা, ওর মা হাজারি বড্ড ভালো লোক ছিল। তার কথা ভাবলে কষ্ট হয়। বড্ড সরল।

সতীশ সেদিন টাকাকড়ি গুনে-গেঁথে নিয়ে চলে গেল বটে, কিন্তু মাসকয়েক পরেই একদিন এসে হাজির হল। সেই চণ্ডীমণ্ডপে হীরুঠাকুরের কাছে তখন আমরা পড়চি। সতীশ ঘোষ এসে বাবাকে প্রণাম করে বললে—সে হয়ে গিয়েচে। আপনাকে আর (আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে) এই খোকাবাবুকে আর এই নায়েববাবুকে একবার যেতে হচ্ছে কালোপুর—

বাবা বললেন— মানে?

—মানে, আপনাদের বলাই আজ তিনদিন হল গরু চরাতে গিয়ে বাজ পড়ে মারা গিয়েচে।

—বাজ পড়ে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মরে মাঠেই পড়েছিল। সন্দের সময় টের পেয়ে তখন সবাই গিয়ে তাকে দেখে পড়ে আছে। নিয়তির খেলা, আপনিই বা কী করবেন, আমিই বা কী করবো! এখন চলুন, অপঘাতে মৃত্যু, তিন দিন অশৌচ, কাল তার শ্রাদ্ধ। সেই টাকাটা আপনি যেমন হুকুম দেবেন, আপনার সামনে খরচ করবো।

বদ্যিনাথ কাকা আর বাবা পরদিন কালোপুর গেলেন, সঙ্গে আমি। আশ্চর্য হলাম আমরা সকলেই সেখানে গিয়ে। সতীশ ঘোষ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, আটচালা বড় ঘর, চণ্ডীমণ্ডপ, সদর অন্দর পৃথক। সবই ঠিক, কিন্তু লোকজনের সমারোহ আয়োজন দেখে আমরা তো অবাক। চারশো টাকায় এত লোক খাওয়ানো যায় না, এমন সমারোহ করা যায় না। হাজারি খুঁড়ির বার্ষিক সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধও ওই সঙ্গে হল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত লোক খাওয়ানোর বিরাম নেই। আজ থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। সস্তাগণ্ডার দিন ছিল বটে, তবুও সাত-আটশো টাকার কমে সেরকম খাওয়ানো যায় না, তত সমারোহই করা যায় না। আর কী যত্নটা করলে আমাদের সতীশ ঘোষ। লুচি, ছানা, সন্দেশ, দই—সব সময়ে হাতজোড় করেই আছে।

বাবা বললেন—সতীশ, এ কী ব্যাপার? তোমার ঘর থেকে কত খরচ করলে? তুমি তাদের কেউ হও না, জ্ঞাতি নও, কুটুম্ব নও, তাদের জন্য এত টাকা—

সে হাতজোড় করে বললে—দেবতা, টাকা তো ময়লা মাটি। আপনি হুকুম দেলেন। বলি, করতে যদি হয় তবে ভিন্ গাঁয়ের মা আর ছেলে বেঘোরে মারা গেল, ওদের শ্রাদ্ধ একটু ভালো করেই করি। আপনি খুশি হয়েচেন, দেবতা?

বদ্যিনাথ কাকা যে অত জাঁহাবাজ ঘুঘুলোক, কালোপুর থেকে ফিরবার পথে বলল— না সত্যি, হাজারি খুঁড়ির পুণ্যি ছিল। তাই টাকাটার সদ্ব্যয় হল। ভালো হাতে পড়েছিল টাকাটা।

ছেলেবেলার কথা এসব। তখন পল্লীগ্রামের লোক এমনি সরল ছিল, ভালো ছিল—আজ বাবাও নেই, সে সতীশ ঘোষও নেই। এখন দূর স্বপ্নের মতো মনে হয় সেসব লোকের কথা। হাজারি খুঁড়ির শ্রাদ্ধের পরে সতীশ ঘোষ আমাদের বাড়িতে অনেকবার এসেছিল। আমার ঠাকুরমাকে মা বলতো, বাবাকে দাদাঠাকুর বলে ডাকতো। সঙ্গে করে আনতো মানকচু, আখের গুড়, ঝিকরহাটি বাজারের কদমা আর জোড়া সন্দেশ। কখনো কখনো ভাঁড়ে করে গাওয়া ঘি আনতো। আমার বড়দিদির বিয়ের সময় ওদের বাড়ির ঝি-বোয়েরাও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। একখানা ভালো কাপড় দিয়েছিল বিয়েতে।

বাবা মারা যাওয়ার পরে আমরা দেশ ছেড়ে বিদেশে যাই। শুনেছিলাম সতীশ ঘোষ মারা গিয়েচে বহুদিন। আর কোনো খোঁজখবর রাখিনে তাদের।